অধ্যায় - ৫

চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে শ্রী সাইবাবার পুণঃ আগমন, অভিনন্দন এবং 'শ্রী সাই' শব্দ দ্বারা সম্বোধন, অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বেশভূষা এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী, পাদুকার কথা, মোহিদ্দীনের সাথে কুস্তি, মোহিদ্দীনের জীবন পরিবর্তণ, জলের তেলে রূপান্তর, নকল গুরু জৌহর আলী।

গত অধ্যায়ে যেমনটি আমি উল্লেখ করেছিলাম, এবার শ্রী সাইবাবার শিরডী থেকে অন্তর্ধাণ হওয়ার পর তাঁর শিরডীতে পুনরায় কিভাবে আগমন হলো - সেটাই বর্ণনা করা হচ্ছে।

চাঁদ পাটীলের শালার বরযাত্রীর সাথে পুণঃ আগমন

ঔরাঙ্গাবাদ জেলার (নিজাম স্টেট) ধূপগ্রামে চাঁদ পাটীল নামক এক ধনী মুসলমান থাকতেন। ঔরঙ্গাবাদ যাওয়ার পথে তাঁর ঘোটকী হারিয়ে যায়। দুমাস ধরে অনেক খোঁজাখুজি করার পরও তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। অবশেষে নিরাশ হয়ে জীনটা কাঁধে ফেলে তিনি ঔরঙ্গাবাদ ফিরছিলেন। প্রায় চোদ্দ মাইল হাঁটার পর তিনি এক জায়গায় একটি আম গাছের নীচে এসে দেখেন এক ফকির সেখানে বসে আছে। তাঁর মাথায় একটা টুপী, গায়ে কফনী এবং কাছেই একটা দণ্ড রাখা ছিল। ফকিরের ডাকে চাঁদ পাটীল তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জীনটা দেখে ফকির জিজ্ঞাসা করেন, "এই লাগাম এখানে কেন?" চাঁদ পাটীল নৈরাশ্য ভরা স্বরে বললেন- "কি আর বলি? আমার একটি ঘোটকী ছিল, সেটা কোথাও হারিয়ে গেছে - এটা তারই লাগাম।"

ফকির বললেন- "একটু নালার দিকে খুঁজে দেখো।" চাঁদ পাটীল নালার কাছে গিয়ে দেখেন ঘোটকী সেখানে ঘাস খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তাঁর খুব আশ্চর্য্য লাগে। তিনি তক্ষুনি বুঝতে পারেন যে, ফকির কোন সাধারণ লোক নয়, বরং কোন উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী পুরুষ। ঘোটকী নিয়ে যখন তিনি ফকিরের কাছে ফিরে আসেন, ততক্ষনে ফকির ছিলিম তৈরী করে নিয়েছেন - শুধু দুটি জিনিষের দরকার ছিল। এক তো ছিলিম জ্বালাবার জন্য আগুন ও দ্বিতীয় কাপড়টা ভেজাবার জন্য জল। ফকির নিজের

চিমটেটি মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে বার করতেই তার সাথে একটা জ্বলন্ত কয়লা বেরোল। সেটা ছিলিমের উপর রাখা হলো। এরপর ফকির পাশে রাখা দন্ডটি দিয়ে যেই মাটির উপর প্রহার করলেন, সেখান থেকে জলের ধারা বেরোতে লাগল এবং কাপড়টা তাতে ভিজিয়ে ছিলিমটা জড়িয়ে নিলেন। এইরূপ সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর বাবা ছিলিমে টান দেন এবং চাঁদ পাটীলের দিকে এগিয়ে দেন। এই সব চমৎকার দেখে চাঁদ পাটীল খুবই বিস্মিত হন। তিনি ফকিরকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। পরের দিন ফকির চাঁদ পাটীলের সাথে তার বাড়ী যান এবং সেখানে কিছুদিন থাকেন। পাটীল ছিলেন ধূপগ্রামের এক উচ্চ পদাধিকারী। তাঁর বাড়ীতে তাঁর শ্যালকের বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। বরযাত্রী শিরডী অভিমুখে রওনা হয়। ফকিরও বরযাত্রীদের সাথে শিরডী যান। বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল এবং বরযাত্রী সকুশলে ধূপগ্রাম ফিরে এলো। কিন্তু সেই ফকির শিরডীতেই থেকে যান এবং শেষ জীবন অবধি সেখানেই থাকেন।

ফকিরের 'সাই' নাম পাওয়া

শিরডী পৌঁছেই বরযাত্রীদের খান্ডোবা মন্দিরের কাছে মহালসাপতির ক্ষেতের মধ্যে একটা গাছের নীচে বিশ্রাম করতে বলা হলো। খান্ডোবা মন্দিরের সামনেই গরুর গাড়ীগুলোকে দাঁড় করানো হয় এবং সব বরযাত্রীরা এক-এক করে নীচে নামে। তরুণ ফকিরকে নীচে নামতে দেখে মহালসাপতি 'এসো সাই' বলে তাঁকে অভিনন্দন জানান। অন্যান্য উপস্থিত লোকেরাও তাঁকে 'সাই' বলেই সম্বোধন করে তাঁকে সম্মান জানান। এর পর থেকে তিনি 'সাই' নামেই প্রসিদ্ধ হন।

অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে সংযোগ

শিরডী আসার পর শ্রী সাইবাবা মস্‌জিদে থাকতে শুরু করলেন। বাবার শিরডী আসার অনেক আগে থেকেই দেবীদাস নামক এক সন্ত বহু বছর ধরে ওখানে থাকতেন। উনি বাবার খুব প্রিয় ছিলেন। বাবা ওঁর সাথে কখনো হনুমান মন্দিরে তো কখনো 'চাওড়ীতে' থাকতেন। কিছুদিন পর জানকীদাস নামক এক সন্ত শিরডীতে আসেন এবং তখন থেকে বাবা জানকীদাসের সাথে কথাবার্তায় অনেকটা সময় কাটাতে শুরু করেন। জানকীদাস কখনো-কখনো বাবার কাছে এসে বসতেন। তেমনি পুন্তাম্বার শ্রী গঙ্গাগীর নামক এক বৈশ্য গৃহী সন্তও প্রায়ই বাবার কাছে আসা-যাওয়া করতেন। প্রথমবার যখন বাবাকে (বাগানে জল দেওয়ার জন্য) জল বইতে দেখে তাঁর খুব

আশ্চর্য্য লাগে। তিনি স্পষ্টই বলেন যে- **"শিরডী পরমভাগ্যবতী, তার কোলে এক অমূল্য হীরে আছে।** তোমরা যাকে এইরূপ পরিশ্রম করতে দেখছ, তিনি কোন সাধারণ বা সামান্য পুরুষ নন। এই ভূমির পরম সৌভাগ্যে যে তার পুণ্যবলে এইখানে এই রত্ন আবির্ভূত হয়েছে।" ঠিক এইরূপ শ্রী আক্কালকোট মহারাজের এক প্রসিদ্ধ শিষ্য সন্তশ্রী আনন্দ নাথ (এওলামঠ), যিনি কিছু শিরডীবাসীদের সাথে শিরডী আসেন, বাবার বিষয়ে এই কথা বলেছিলেন, **"যদিও বাইরে থেকে এঁকে সাধারণ মানুষের মতনই মনে হয়, কিন্তু ইনি আসলে এক অসাধারণ ব্যক্তি।** এই কথা তোমরা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অনুভব করবে।" এইরূপ বলে তিনি এওলা ফিরে যান। এটা সেই সময়কার কথা, যে সময় শিরডী খুবই সাধারণ গ্রাম ছিল এবং সাইবাবার বয়সও ছিল কম।

বাবার পোষাক পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন কর্মসূচী

তরুণ অবস্থায় শ্রী বাবা নিজের চুল কখনো কাটতেন না এবং তিনি সব সময়ই পালোয়ানদের মত পোষাক পরে থাকতেন। রাহাতা (শিরডী থেকে তিন মাইল দূর) গেলে সেখান থেকে তিনি গেঁদা, জুঁই ইত্যাদির গাছ কিনে আনতেন। সেগুলিকে পরিষ্কার করে মাটিতে পুঁতে তাতে নিজে জল দিতেন। বামন তাত্য়া নামক এক ভক্ত তাঁকে রোজ মাটির দুটো ঘড়া দিত। বাবা এই ঘড়ায় করে গাছে জল দিতেন। তিনি নিজে কূয়ো থেকে জল আনতেন এবং সন্ধ্যার সময় ঘড়া দুটিকে নিম গাছের নীচে রেখে দিতেন। নীচে রাখতেই সেগুলি ভেঙ্গে যেত। আগুনে না তাপিয়ে (সেঁকে) সেগুলি কাঁচা মাটি দিয়ে গড়া হত। পরের দিনে তাত্য়া আবার বাবাকে দুটো নতুন ঘড়া দিতো। এইরকম ব্যবস্থা তিন বছর পর্যন্ত চলল। শ্রী সাইবাবার কঠিন পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলস্বরূপ একটি সুন্দর বাগান তৈরী হয়েছিল। আজকাল এই স্থানটিতেই বাবার সমাধি মন্দিরের সুন্দর ভবন শোভায়মান, যেখানে সহস্র ভক্ত আসা-যাওয়া করে।

নিম বৃক্ষের নীচে পাদুকার কাহিনী

শ্রী আক্কালকোট্ মহারাজের এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণজী অলীবাগকর তাঁর ছবির নিয়মিত পূজো করতেন। উনি একবার আক্কালকোট্ (সোলাপুর জিলা) গিয়ে মহারাজের পাদুকার দর্শন এবং পুজো করবেন স্থির করেন। কিন্তু আক্কালকোট্ মহারাজ স্বপ্নে দর্শন দিয়ে ওঁকে বলেন- "আজকাল শিরডীই আমার বিশ্রাম স্থল এবং তুমি ওখানে গিয়েই আমার পুজো করো।" সেই জন্য তিনি গন্তব্য স্থান বদলে শিরডী এসে শ্রী সাইবাবার পূজো

করেন। তিনি সানন্দে শিরডীতে ছমাস থাকেন এবং এই স্বপ্নের স্মৃতিস্বরূপ পাদুকা নির্মিত করান। ১৯১২ সালে শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন নিম বৃক্ষের নীচে পাদুকা স্থাপিত করেন। দাদা কেলকর এবং উপাসনী মহারাজ স্থাপনা উৎসব যথাবিধি রূপে সম্পন্ন করেন। একটি দীক্ষিত ব্রাহ্মণ পুজোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থার ভার এক ভক্ত শ্রী সগুন মেরু নায়ককে দেওয়া হয়।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণ

ঠানার অবসরপ্রাপ্ত মামলাতদার শ্রী বি. ভি. দেব (শ্রী সাইবাবার এক পরমভক্ত) সগুন মেরু নায়ক ও গোবিন্দ কমলাকর দীক্ষিতকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পাদুকার সম্পূর্ণ বিবরণ শ্রী সাই লীলা ভাগ ১১ সংখ্যা ১, পৃষ্ঠ ২৫ প্রকাশিত হয়েছিল। নীচে সেই বিবরণই দেওয়া হচ্ছে ঃ-

১৯১২ সালে বম্বের এক ভক্ত (ডাক্তার) রামরাও কোঠারে বাবার দর্শনের জন্য শিরড়ী এসেছিলেন। ওঁর কম্পাউন্ডার ও এক বন্ধু শ্রী কৃষ্ণরাও অলীবাগকরও ওঁর সঙ্গে শিরড়ী আসেন। কম্পাউন্ডার ও ভাইয়ের শ্রী সগুণ মেরু নায়ক এবং জী. কে. দীক্ষিতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করতে-করতে এঁদের মনে হয় যে, শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন এবং নিমবৃক্ষের নীচে বাসের ঐতিহাসিক স্মৃতিস্বরূপ, কেন না পাদুকা স্থাপিত করা হোক? এবার পাদুকা নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। তখন ভাইয়ের বন্ধু কম্পাউন্ডার বললেন- "যদি এই কথাটি আমার মনিব শ্রী কোঠারে জানতে পারেন, তাহলে এই কাজের জন্য অতি সুন্দর পাদুকা বানিয়ে দেবেন।" এই প্রস্তাবটি সবার মনে ধরে এবং ডা. কোঠারেকে এ বিষয়ে খবর দেওয়া হলো। উনি শিরডী এসে পাদুকার একটি নক্শা আঁকেন এবং এ বিষয়ে উপাসনী মহারাজের সাথে খান্ডোবা মন্দিরে দেখা করেন। উপাসনী মহারাজ তাতে কিছু পরিবর্তণ করে এবং পদ্মফুলাদি এঁকে তার নীচে নিম বৃক্ষের মাহাত্ম্য ও বাবার যোগশক্তি সম্বন্ধে একটি শ্লোকও লিখে দেন। শ্লোকটি এইরূপঃ-

সদা নিম্ব-বৃক্ষস্য মূলাধিবাসাত্
সুধাস্রাভিনং তিক্তমপ্যপ্রিয়তম্
তরুম্ কল্প-বৃক্ষাদিকং সাধয়ান্তম্
নমামীশ্বরং সদ্গুরুং সাইনাথাম্

অর্থাৎ - আমি ভগবান সাইনাথকে প্রণাম করছি, যাঁর সান্নিধ্যে নিম বৃক্ষ কটু

এবং অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অমৃত বর্ষণ করছে। এই বৃক্ষের রসকে অমৃত বলা হয়। অনেক ব্যাধি হতে মুক্তি দেওয়ার গুণ এতে থাকার দরুণ একে কল্পবৃক্ষ'র চেয়েও শ্রেষ্ঠ মানা হয়।

উপাসনী মহারাজের বিচার সর্বমান্য এবং কার্যান্বিত হলো। পাদুকার জোড়া বম্বেতে তৈরী করানোর পর কম্পাউন্ডারের হাতে শিরডী পাঠানো হয়েছিল। বাবার আজ্ঞা অনুসারে পাদুকার স্থাপনা শ্রাবণ পূর্ণিমার শুভদিনে করা হলো। ঐ দিন বেলা ১১ টা নাগাদ শ্রী জি. কে. দীক্ষিত বাবার পাদুকা মাথায় ধারণ করে খান্ডোবা মন্দির থেকে দ্বারকামাইতে খুব ধূমধাম করে নিয়ে আসেন। বাবা পাদুকা দুটি স্পর্শ করে বললেন- "এইটি ভগবানের শ্রীচরণ। নিম বৃক্ষের নীচে স্থাপনা করে দাও।" এর একদিন আগেই বম্বের এক পারসী ভক্ত শ্রী পান্তা সেঠ মানী অর্ডারের মাধ্যমে ২৫ টাকা পাঠান। বাবা সেই টাকাটি পাদুকা স্থাপনার নিমিত্তে দেন। এই সমারোহে (স্থাপনার কার্য্যে) ঠিক একশো টাকা ব্যয় হয়, যার মধ্যে পঁচাত্তর টাকা চাঁদারদ্বারা একত্রিত করা হয়েছিল। প্রথম পাঁচ বছর ডাঃ কোঠারে প্রদীপের জন্য প্রত্যেক মাসে দুটাকা করে পাঠাতেন। পাদুকার চারিপাশে লাগাবার জন্য লোহার ছড়ীও পাঠান। আজকাল জড়বাড়ী (নানা পূজারী) পূজো করেন এবং সগুণ মেরু নায়ক নৈবেদ্য অর্পণ করেন ও সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালান। ভাই কৃষ্ণজী আগে আক্কালকোট মহারাজের শিষ্য ছিলেন। আক্কালকোট যাওয়ার পথে উনি পাদুকা স্থাপনার শুভ উপলক্ষে শিরড়ী আসেন এবং দর্শন করার পর যখন উনি প্রস্থান করার জন্য বাবার কাছে অনুমতি নিতে যান, তখন বাবা বলেন- "আরে, আক্কালকোটে কি আছে? তুমি ওখানে মিছিমিছি কেন যাচ্ছো? ওখানকার মহারাজ (আমি স্বয়ং) তো এখানেই আছেন।" এই কথা শুনে ভাই আক্কালকোট যাওয়ার বিচার ছেড়ে দেন। পাদুকা স্থাপনার পরও উনি প্রায়ই শিরডী আসতেন। শ্রী বি. ভি. দেব শেষে লিখেছেন যে, এই সব ঘটনাগুলি শ্রী হেমাডপন্ত জানতেন না। নতুবা শ্রী সাই চরিত্রে লিখতে ভুলতেন না।

মোহিদ্দীন তম্বোলীর সাথে কুস্তি ও জীবন পরিবর্তন

শিরডীতে মোহিদ্দীন তম্বোলী নামক এক পালোয়ান ছিল। কোন এক বিষয় নিয়ে ওর বাবার সাথে মতভেদ হয়। ফলতঃ দুজনের মধ্যে কুস্তি হয় এবং বাবা হেরে যান। এর পর বাবা নিজের পোষাক ও থাকার ধরণ-ধারণ বদলে ফেলেন। তিনি কফ্নী ও লেংগোট পড়তেন এবং একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাথাটা ঢেকে রাখতেন। বসবার ও শোওয়ার জন্য একটা টাটের টুকরো ব্যবহার করতেন। এইরূপ ছেঁড়া-মেড়া

কাপড় পরেও তিনি খুবই সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি সর্বদাই বলতেন- "দারিদ্রতাই আসল রাজকীয় সম্পদ, ধনীর চেয়ে দরিদ্র লাখ গুণে ভাল, ভগবান গরীবের ভাই।" গঙ্গাগীরেরও কুস্তী লড়ার খুব সখ ছিল। এক সময় কুস্তী লড়তে লড়তে হঠাৎ ওঁর মনে ত্যাগের ভাবনা জাগে। এই উপযুক্ত সময় উনি দেববাণী শোনেন, **"ভগবানের সাথে খেলায় নিজের দেহকে লাগিয়ে দেওয়া উচিত।"** তাই ওঁর সংসার ছেড়ে আত্ম-অনুভূতির পথে চলার তীব্র ইচ্ছে জাগে। পূণতাম্বার কাছে একটি মঠ বানিয়ে নিজের শিষ্যদের সাথে সেখানে থাকতে শুরু করেন। শ্রী সাইবাবা লোকেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না আর নাই বিশেষ কথাবার্তা করতেন। যদি কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করত, তখন তিনি শুধু তার উত্তরটা দিতেন। দিনের বেলা তিনি নিম বৃক্ষের নীচে বিরাজমান থাকতেন। কখনো-কখনো গ্রামের সীমাতে নালার কাছে গাছের ছায়ায় বসে থাকতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় যেদিকে খুশী সেদিকে বেড়াতে বেরিয়ে যেতেন। নিমগ্রামের বালাসাহেব ডেঙ্গলের বাড়ী প্রায়ই চলে যেতেন। বাবা শ্রী বালাসাহেবকে খুব ভালোবাসতেন। ওঁর ছোট ভাই শ্রী নানালাহেবের দ্বিতীয় বার বিয়ে করা সত্ত্বেও কোন সন্তান হয়নি। বালাসাহেব নানাসাহেবকে শ্রী সাইবাবার দর্শনার্থে শিরডী পাঠান। কিছুদিন পর বাবার শ্রীকৃপায় নানাসাহেবের বাড়ীতে পুত্রের জন্ম হয়। এরপর থেকেই বাবার দর্শনের জন্য লোকেদের সংখ্যা দিনের-পর-দিন বাড়তে থাকে। তাঁর নাম ও কীর্তি দূর-দূর প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে যায়। আহমদ নগরেও তাঁর খুব নাম হয়ে পড়েছিল। নানাসাহেব চাঁদোরকর, কেশব চিদম্বর এবং অন্যান্য ভক্তদের তখন থেকেই শিরড়ীতে আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন বাবা ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন ও রাতে জীর্ণ-শীর্ণ মস্‌জিদে বিশ্রাম করতেন। এই সময় বাবার কাছে ছিলিম, তামাক, একটি বড় গেলাস, একটি লম্বা কফ্‌নী, মাথায় বাঁধবার কাপড় এবং একটি ছোট ডান্ডা ছিল যেটি তিনি সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন। মাথায় একটা সাদা কাপড়ের টুকরো এমনভাবে বাঁধতেন যে কাপড়ের একটা দিক তাঁর বাঁ কাঁধ দিয়ে পিঠে পড়ে থাকত, যেন চুলের একটি খোঁপা। পায়ে কোন জুতো-চটী পরতেন না। শুধু একটা টাটের টুকরো অধিকাংশ দিন তাঁর আসন হিসেবে কাজ দিত। তিনি ধুনিতে কাঠের টুকরোর রূপে নিজের অহংকার, সমস্ত ইচ্ছা এবং কুবিচারগুলির আহুতি দিতেন। সর্বক্ষণ 'আল্লাহ মালিক' উচ্চারণ করতেন। তিনি যে মস্‌জিদে পদার্পণ করেন, তাতে কেবল দুটি ঘরের মত লম্বা জায়গা ছিল এবং এখানেই সব ভক্তরা তাঁকে দর্শন করত। ১৯১২র পর কিছু পরিবর্তণ ঘটে। পুরোন মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কার করা হয় এবং তার মেঝেও বানানো হয়। মস্‌জিদে থাকতে শুরু করার আগে বাবা তাকিয়াতে (ফকিরদের বাসস্থান)

থাকতেন। তিনি পায়ে নুপূর বেঁধে প্রেমবিহ্বল হয়ে সুন্দর নৃত্য ও গানও করতেন।

জলের তেলে পরিণত হওয়া

বাবা আলো খুব ভালবাসতেন। তিনি সন্ধ্যাবেলা তেল ভিক্ষে করে নিয়ে আসতেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে মস্‌জিদ সাজাতেন। এইরূপ কিছুদিন সব ঠিক চলল। এবার একদিন ময়রারা উত্যক্ত হয়ে উঠল এবং স্থির করল যে সেদিন কেউ বাবাকে তেল দেবে না। নিত্য নিয়মানুসারে যখন বাবা তেল চাইতে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে প্রত্যেক দোকান থেকেই খালি হাতে ফিরে আসতে হলো। কাউকে কিছু না বলে বাবা মস্‌জিদে ফিরে এলেন। শুকনো তুলোর সলতে প্রদীপ গুলিতে পরালেন। ময়রারা খুব উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল- বাবা এবার কি করবেন? বাবা বড় গেলাসটি যাতে অল্প একটু তেল ছিল, ওঠালেন। তাতে একটু জল মিশিয়ে সেটাকে পান করে নিলেন। সেটাকে আবার গেলাসে উগড়ে সেই তৈলাক্ত জল প্রদীপগুলিতে ঢেলে সেগুলি জ্বালিয়ে দিলেন। উৎসুক ময়রারা যখন প্রদীপগুলিকে আগের মতই রাতভোর জ্বলতে দেখে নিজেদের ব্যবহারের জন্য খুবই লজ্জিত বোধ করল। ওরা বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল। বাবা তাদের ক্ষমা করে ভবিষ্যতে সৎ আচরণ করার শিক্ষা দেন।

নকল গুরু জৌহর আলী

পূর্বে বর্ণিত কুস্তির ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর জৌহর আলী নামক এক ফকীর নিজের শিষ্যদের সাথে রাহাতা আসেন। উনি বীরভদ্র মন্দিরের কাছে একটা বাড়ীতে থাকতেন। ফকির বিদ্বান ছিল। কোরানের প্রত্যেকটি কল্‌মা কণ্ঠস্থ ছিল এবং স্বরও মধুর ছিল। গ্রামের অনেক ধার্মিক ও শ্রদ্ধালু জন ওঁর কাছে আসতে শুরু করে। লোকেদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করে বীরভদ্র মন্দিরের কাছে একটা ইদগাহ নির্মাণ করাবার কথা স্থির করে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু ঝগড়ার সৃষ্টি হওয়ায় জৌহর আলী রাহাতা ছেড়ে শিরড়ী এসে বাবার সাথে মস্‌জিদেই বাস করতে শুরু করে। নিজের মিষ্টি মধুর কথায় উনি সহজেই শিরডী বাসীদের মন জিতে নেন এবং বাবাকে নিজের শিষ্য বলে প্রচার করেন। বাবা তাতে কোন আপত্তি প্রকাশ করেন না এবং ওর শিষ্য হওয়া স্বীকার করেন। এরপর গুরু ও শিষ্য আবার রাহাতাতে এসে থাকতে শুরু করেন। গুরু শিষ্যের যোগ্যতার বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু শিষ্য গুরুর দোষের ব্যপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তা সত্ত্বেও বাবা কখনো ওঁকে অশ্রদ্ধা করেননি এবং মন দিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করে ওঁর অনেক ভাবে সেবা করেন। তাঁরা

কখনো-কখনো শিরড়ী আসতেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় রাহাতাতেই থাকতেন। বাবার ভক্ত-প্রেমীদের তাঁর দূরে রাহাতাতে থাকাটা একেবারেই ভালো লাগছিল না। তাই ওরা সবাই মিলে বাবাকে শিরডীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য রাহাতা গেল। 'ঈদগা'-র কাছেই এদের বাবার সাথে দেখা হয় এবং ওরা নিজেদের উদ্দেশ্য বাবাকে জানায়। তখন বাবা বলেন যে ফকির ভীষণ রাগী ও বদ্‌মেজাজী লোক; উনি বাবাকে কিছুতেই ছাড়বেন না। ফকিরের আসার আগেই বাবা তাদের ফিরে যেতে বলেন। যখন এইরূপ কথাবার্তা চলছিল, সেই সময় ফকির সেখানে এসে পৌঁছয়। গ্রামবাসীদের জল্পনা-কল্পনার কথা জেনে উনি খুবই রেগে ওঠেন। কিছুক্ষণ বাদ-বিবাদের পরিস্থিতিতে কিছু পরিবর্তণ দেখা দেয়। শেষে এই নির্ণয় হয় যে, ফকির আর শিষ্য দুজনই শিরডীতে থাকবেন এবং এইভাবে ওঁরা শিরডীতেই থাকতে শুরু করেন। কিছুদিন পর দেবীদাস গুরুর পরীক্ষা নেন এবং কিছু ত্রুটি পান। চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে বাবার শিরডী আসার প্রায় ১২ বছর আগে শিরডী আসেন- তখন ওঁর বয়স ছিল ১০-১১ বছর এবং উনি হনুমান মন্দিরে থাকতেন। দেবীদাস তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পুরুষ ছিলেন। তিনি ত্যাগের সাক্ষাত প্রতিমূর্তি ও অগাধ জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন। অনেক লোকেরা, যেমন-তাত্‌য়া কোতে, কাশীনাথ ইত্যাদি তাঁকে গুরুর ন্যায় সম্মান করত। তাই জৌহর আলীকে তাঁর সামনে আনা হলো। তর্কে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে জৌহর আলী শিরডী থেকে পালিয়ে যান। অনেক বছর পর উনি শিরডী আসেন এবং শ্রী সাইবাবার চরণ বন্দনা করে। তিনি গুরু ও শ্রী সাইবাবা তাঁর শিষ্য - ওঁর এই ধারনা দূর হয়ে গিয়েছিল। শ্রী সাইবাবা তাঁকে গুরুর মতনই মান দিতেন, এই কথা স্মরণ করে ওঁর খুব অনুতাপ হয়। এইভাবে শ্রী বাবা নিজের আচরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলেন যে এইভাবে অহংকারশূণ্য হয়ে শিষ্যের কর্তব্য পালন করে, আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। উপরে উদ্ধৃত ঘটনাক্রম ভক্ত মহালসাপতির কাছ থেকে জানা যায়। এর পরের অধ্যায়ে রাম নবমীর উৎসব, পূর্বে মস্‌জিদের দশা, পরে তার জীর্ণতা সংস্কার ইত্যাদি বর্ণনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।